ইসলাম ধর্ম

ইসলাম (আরবি: الإسلام) একটি একেশ্বরবাদী এবং আব্রাহামিক ধর্ম; যা কুরআন (যা এমন এক কিতাব যা হবহু আল্লাহর [১] বানী) এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রদত্ত শিক্ষা পদ্ধতি, জীবনাদর্শ (বলা হয় সুন্নাহ এবং হাদিস নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে) দ্বারা পরিচালিত। ইসলামের অনুসারীরা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শেষ নবী বলে মনে করেন।

ইসলাম (আরবি: الإسلام) শব্দটি এসেছে আরবি س-ل-م শব্দটি হতে যার দু'টি অর্থ; ১▪ শান্তি ২▪ আত্মসমর্পণ করা। সংক্ষেপে, ইসলাম হলো শান্তি (প্রতিষ্ঠা)'র উদ্দেশ্যে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর (আল্লাহ)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করা।

অনেকের ধারণা যে মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন এই ধর্মের প্রবর্তক। তবে মুসলমানদের মতে, তিনি এই ধর্মের প্রবর্তক নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল (পয়গম্বর)। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে তিনি এই ধর্ম পুনঃপ্রচার করেন। পবিত্র কুরআন ইসলাম ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মে বিশ্বাসীদের মুসলমান বা মুসলিম বলা হয় (তবে আলকোরআনের বিধান মতে কেবল মাত্র এই ধর্মে বিশ্বাসী হলেই তাকে "মুসলিম" বলা যাবে না । দুনিয়ার যে কোন ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষই হোক, যারা এই ধর্মে নিজেকে শতভাগ সমর্পন করতে পারবেন, কেবল তাদেরকেই বলা হবে "মুসলিম" সূত্রঃ- সূরা বাকারাহ-আয়াত ২০৮) । পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী এবং এটি তার দ্বারা ফেরেসতা জীব্রাইল (আ:) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট প্রেরিত বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন। তাদের বিশ্বাস অনুসারে মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। হাদিসে প্রাপ্ত তাঁর নির্দেশিত কাজ ও শিক্ষার ভিত্তিতে কুরআনকে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে, কোনো হাদিসের মর্মার্থ কুরআনের বিরুদ্ধে গেলে, তা বাতিল বলে গণ্য হয়।

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন ধর্ম যা এর আগে অনেক নবী ও রাসুল এর প্রতি নাযিল হয়েছিল। তারা আরও বিশ্বাস করে যে কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত সর্বশেষ জীবন বিধান।

মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের উপর। এই দিনটিকে হাশরের দিন বলা হয় । এই দিন প্রত্যেক মানুষের কাজের বিচার করা হবে এবং এর বিনিময়ে বেহেশত বা দোযখে পাঠানো হবে ।

মুসলমানরা বিশ্বাস করে ভাগ্যের ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

ইহুদি ও খৃস্ট ধর্মের ন্যায় ইসলাম ধর্মও ইব্রাহিমীয়।[২] বর্তমান বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা আনুমানিক 1.8 বিলিয়ন এবং তারা পৃথিবীর প্রধান ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীসমূহ।। এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী। [৩] মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার উত্তরসূরীদের প্রচার ও যুদ্ধ জয়ের ফলশ্রুতিতে ইসলাম দ্রুত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। [৪] বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ইউরোপে মুসলমানরা বাস করেন।

আরবে এ ধর্মের গোড়াপত্তন হলেও অধিকাংশ মুসলমান আন্যাংশ। আরব দেশের মুসলমানরা মোট মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২০ বিশ ভাগ।[৫] যুক্তরাজ্যসহ বেশ কিছু বলকান অঞ্চল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম ইসলাম।[৬][৭]

ধর্ম বিশ্বাস

মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি আল্লাহর একত্ববাদ। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য তাঁর বাণী ফেরেস্তা জীব্রাইল-এর মাধ্যমে রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ করেন। কুরআনে বর্ণিত "খতমে নবুয়্যত" এর ভিত্তিতে মুসলমানরা তাঁকে শেষ বাণীবাহক (রাসূল) বলে বিশ্বাস করেন। তারা আরও বিশ্বাস করেন, তাদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন নিখুঁত, অবিকৃত ও মানব এবং জ্বিন জাতির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ আল্লাহর সর্বশেষ বাণী, যা পুনরুত্থান দিবস বা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল ও কার্যকর থাকবে। তবে কিছু বাতিল সম্প্রদায় আহ্মদি বা কাদিয়ানী নামক একটি সম্প্রদায় মনে করে মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী নন বরং যুগের চাহিদা মোতাবেক নবুওয়াতের ধারা অব্যহত থাকবে।[৮] এবং শিয়াদের একটি বিরাট অংশবিশেষ ইসমাঈলীয়দের বা ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস যে, ইমাম ইসমাঈল আখেরী নবী ছিলেন। [৯]

আদম হতে শুরু করে আল্লাহ্ প্রেরিত সকল পুরুষ ইসলামের বাণীই প্রচার করে গেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে,

> “ "নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে (মুহাম্মদ) পাঠিয়েছি সত্যের সাথে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। আর এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যাঁদের মধ্যে একজন সতর্ককারী পাঠানো হয়নি।"৩৫:২৪[১০] ”

ইসলামের দৃষ্টিতে ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় ধর্মাবলম্বীরাই আব্রাহামের শিক্ষার ঐতিহ্য পরম্পরা। উভয় ধর্মাবলম্বীকে কুরআনে "আহলে কিতাব" বলে সম্বোধন করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানে আহবান করা হয়েছে,

> “ "তুমি (মুহাম্মদ) বল, হে কিতাবীগণ, এসো সেই কথায় যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে এক; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি। কোনো কিছুকেই তাঁর শরিক না করি। এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য হিসেবে গ্রহণ না করি। যদি তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা স্বাক্ষী থাক; অবশ্যই আমরা মুসলিম।"৩:৬৪[১০]”

এই ধর্ম দুটির গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের উল্লেখ কুরআনেও রয়েছে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রয়েছে পার্থক্য। ইসলামি বিশ্বাসানুসারে এই দুই ধর্মের অনুসারীগণ তাদের নিকট প্রদত্ত আল্লাহ্-এর বাণীর অর্থগত ও নানাবিধ বিকৃতসাধন করেছেন; ইহুদিগণ তৌরাতকে (তোরাহ) ও খৃস্টানগণ ইনজিলকে (নতুন বাইবেল)।

ইসলাম ধর্ম আদি এবং অন্ত এবং স্রষ্টার নিকট একমাত্র গ্রহনযোগ্য ধর্ম।

” যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বেছে নিবে সে কষ্মিনকালেও সফলকাম হতে পারবেনা এবং সে হবে চরম ক্ষতি গ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সূরা আল ইমরান, আয়াত :৮৫)

আল্লাহ্

মুসলমানগণ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' বলে সম্বোধন করেন। ইসলামের মূল বিশ্বাস হলো আল্লাহর একত্ববাদ বা তৌহিদ। ইসলাম পরম একেশ্বরবাদী ও কোনোভাবেই আপেক্ষিক বা বহুত্ববাদী নয়। আল্লাহর একত্ব ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে প্‌রথম, যাকে বলা হয় শাহাদাহ। এটি পাঠের মাধ্যমে একজন স্বীকার করেন যে, (এক) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই এবং (দুই) মুহাম্মদ [(সাঃ)] তাঁর প্রেরিত বাণীবাহক বা রাসূল সুরা এখলাছে আল্লাহর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে, [قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ] {الاخ لاص:১-৪}

“   "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"১১২:১-৪[১০]   ”

আল্লাহ্ শব্দটি আল এবং ইলাহ যোগে গঠিত। আল অর্থ সুনির্দিষ্ট এবং ইলাহ অর্থ উপাস্য, যার অর্থ সুনির্দিষ্ট উপাস্য। খৃস্টানগণ খৃস্ট ধর্মকে একেশ্বরবাদী বলে দাবী করলেও মুসলমানগণ খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ (trinity) বা এক ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মিলন, এই বিশ্বাসকে বহু-ঈশ্বরবাদী ধারণা বলে অস্বীকার করেন। কারণ 1+1+1=3 হয় কিন্তু 1+1+1=1 হয় না । ইসলামি ধারণায় আল্লাহ সম্পূর্ণ অতুলনীয় ও পৌত্তলিকতার অসমতুল্য, যার কোনোপ্রকার আবয়বিক বর্ণনা অসম্ভব। মুসলমানরা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে বর্ণনা করেন তাঁর বিভিন্ন গুণবাচক নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে।

কিতাবুল ঈমানে আল্লাহর বর্ণনা এভাবে আছে :

” আল্লাহ এক,অদ্বিতীয়,অতুলনীয়। তার কোন অংশ বা অংশিদার বা শরিক নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষি নন, বরং সকলেই তার মুখাপেক্ষি । তার কোন কিছুর অভাব নেই । তিনিই সকলের অভাব পূরণকারী।

তিনি কারো পিতা নন, পুত্র নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই ।

একমাত্র তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা,রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা ।

কোন জ্ঞান বা চক্ষু আল্লাহ তাআলাকে আয়ত্ব করতে পারেনা ।

তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত।

আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই । তিনি একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য । “ তিনি সর্বশক্তিমান।আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে ঘটমান সব কিছু দেখতে ও শুনতে পান।

মূল কথা আল্লাহর বর্ণনা মানুষের কল্পনা,বিজ্ঞান বা দর্শন দ্বারা আনুভব করা সম্ভব না, কারণ মানব মস্তিষ্কের শক্তি সীমাবদ্ধ।

ফেরেশতা

ফিরিশতা বা ফেরেশতা ফারসী শব্দ। ফেরেশতা আরবী প্রতিশব্দ হলো 'মালাইকা'। ফেরেশতায় বিশ্বাস ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের একটি মূল নীতি। এরা অন্য সকল সৃষ্টির মতই আল্লাহর আরেক সৃষ্টি। তাঁরা মুলত আল্লাহর দূত। তারা সর্বদা ও সর্বত্র আল্লাহর বিভিন্ন আদেশ পালনে রত এবং আল্লাহর অবাধ্য হবার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। ফেরেশতারা নূর তথা আলোর তৈরি। রূহানিক জীব বলে তারা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন না। তারা সুগন্ধের অভিলাষী এবং পবিত্র স্থানে অবস্থান করেন। তারা আল্লাহর আদেশ অনুসারে যেকোনো স্থানে গমনাগমন ও আকৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন।

ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত। ইসলামে তাদের কোনো শ্রেণীবিন্যাস করা না হলেও চারজন গুরুদায়িত্ব অর্পিত প্রধান ফেরেশতার নাম উল্লেখযোগ্য:

জিব্রাইল (আ:) – ইনি আল্লাহর দূত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা। এই ফেরেশতার নাম তিনবার কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা ২:৯৭; ৯৮, ৬৬:৪)। সূরা ১৬:১০২ আয়াতে জিব্রাইল ফেরেশতাকে পাক রূহ বা রুহুল কুদুস বলা হয়েছে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং সংবাদ আদান-প্রদান যেসব ফেরেশতার দায়িত্ব, জিব্রাইল তাদের প্রধান। জিব্রাইল-ই আল্লাহর বাণী নিয়ে নবীদের কাছে গমনাগমন করেন। এই ফেরেশতাকে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার নিজস্ব আকৃতিতে মোট দুইবার দেখেছেন। পবিত্র কোরআনে সূরা আন নাজমে বলা হয়েছে,

“ "সে ঊর্ধ্বাকাশের উপরিভাগে। তারপর সে কাছে এলো। অতঃপর সে আরো কাছে এলো। তাঁদের মাঝে ব্যবধান থাকল দুই ধনুকের বা তাঁর চাইতেও কম। অতঃপর সে তাঁর বান্দার কাছে ওহী পৌঁছে দিল, যা তাঁর পৌঁছানোর ছিল। সে যা দেখেছে, অন্তর তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি। তোমরা কী সে বিষয়ে বিতর্কে

লিপ্ত হতে চাও, যা সে নিজের চোখে দেখেছে। সে তাঁকে আরও একবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুন্তাহার কাছে।" ৫৩:৭-১৪ [১০] "

প্রাসঙ্গিক হাদিসসমূহ: মুসলিম শরীফ ৩২৯, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪ এবং ৩৩৬ [১১]

ফেরেশতা মিকাইল(আ:) – কুরআনের ২:৯৭ আয়াতে এই ফেরেশতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ফেরেশতা ইসরাফিল(আ:) – এই ফেরেস্তা আল্লাহর আদেশ পাওয়া মাত্র শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে কিয়ামত বা বিশ্বপ্রলয় ঘটাবেন। তার কথা কুরআন শরীফে বলা না হলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

মালাক আল-মাউত বা আজরাইল (আ:) – ইনি মৃত্যুর ফেরেশতা ও প্রাণ হরণ করেন।

বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতা যাদেরকে কুরআনে 'কিরামান কাতিবিন' (অর্থ: সম্মানিত লেখকগণ) বলা হয়েছে তাঁরা প্রতিটি মানুষের ভালো মন্দ কাজের হিসাব রাখেন। কবরে মুনকির ও নাকির নামের দুই ফেরেশতা মানুষকে তার কৃত কর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মালিক নামের ফেরেশতা নরক বা জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং রিদওয়ান নামের আরেক ফেরেশতা জান্নাত বা বেহেশতের দেখভাল করেন বলে বর্ণিত আছে। ইসলাম, খৃস্টান ও ইহুদী ধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্মেও ফেরেশতা তথা স্বর্গীয় দূতদের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে।

আসমানী কিতাবসমূহ

প্রধান আসমানী কিতাব ৪ টি । যথাঃ ১. তাওরাত ২. যবূর ৩. ইঞ্জিল ৪. কুরআন মাজীদ

আল-কুরআন

কুরআন মুসলমানদের মূল ধর্মগ্রন্থ। তাদের বিশ্বাস পবিত্র এই কুরআন স্রষ্টার অবিকৃত, হুবহু বক্তব্য। এর আগে স্রষ্টা প্রত্যেক জাতিকে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেগুলোকে বিকৃত করা হয়। কুরআনকে আরও বলা হয় "আল-কুরআন" বা "কুরআন শরীফ"। বাংলায় "কুরআন"-এর জায়গায় বানানভেদে "কোরআন" বা "কোরান"ও লিখতে দেখা যায়।

ইসলাম ধর্মমতে, জীব্রাইল (আ:) ফেরেশতার মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬ই জুলাই, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু অবধি বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তাঁর বাণী অবতীর্ণ করেন। এই বাণী তাঁর (মুহাম্মদ সা:) অন্তঃস্থ ছিলো, সংরক্ষণের জন্য তাঁর অনুসারীদের দ্বারা পাথর, পাতা ও চামড়ার ওপর লিখেও রাখা হয়।

অধিকাংশ মুসলমান পবিত্র কুরআনের যেকোনো পাণ্ডুলিপিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, স্পর্শ করার পূর্বে ওজু করে নেন। । কুরআন জীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়লে আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেয়া হয় না, বরং কবর দেয়ার মত করে মাটির নিচে রেখে দেয়া হয় বা পরিষ্কার স্রোতের পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয়।

প্রত্যেক মুসলমানই কুরআনের কিছু অংশ এর মূল ভাষা আরবিতে মুখস্থ করে থাকেন, কমপক্ষে যেটুকু আয়াত নামাজ আদায়ের জন্য পড়া হয়। সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থকারীদের হাফিজ (সংরক্ষণকারী) বলা হয়। মুসলমানরা আরবি কুরআনকেই কেবলমাত্র নিখুঁত বলে বিশ্বাস করেন। সকল অনুবাদ মানুষের কাজ বিধায় এতে ভুল-ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং বিষয়বস্তুর মূল প্রেরণা ও সঙ্গেটিক উপস্থাপনা অনুবাদকর্মে অনুপস্থিত থাকতে পারে বিধায় অনুবাদসমূহকে কখনোই আরবি কুরআনের সমতুল্য ও সমান নিখুঁত গণ্য করা হয় না, বরং এগুলোকে সর্বোচ্চ ‘অর্থানুবাদ’ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

কুরআনকে কোনো অবস্থাতেই বিকৃত করা সম্ভব নয় । আল্লাহ নিজেই এই কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন । প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ছাত্র সমগ্র পৃথিবীতে এই কুরআন মুখস্থ করেন এবং এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন ।

নবী ও রসূলগণ

মুসলমানরা বিশ্বাস করে হযরত আদম(আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত আল্লাহ পৃথিবীতে প্রায় ১,২৪,০০০ (আনুমানিক) নবী ও রাসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ।

মুসলমানগণ বিশ্বাস করে ঈসা(আঃ) আল্লাহর পুত্র নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল । তাঁর উপর ইঞ্জিল কিতাব নাজিল হয়েছে। তিনি কেয়ামতের আগে আবার পৃথিবীতে আবার আসবেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসারী হিসেবে মৃত্যু বরণ করবেন ।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

মুহাম্মাদ[৪] (২৯ আগস্ট ৫৭০[২] - ৮ জুন ৬৩২;[৫] আরবি উচ্চারণ শুনতে ক্লিক করুন محمد (সাহায্য· তথ্য) মোহাম্মদ এবং মুহম্মদ নামেও পরিচিত; তুর্কি : মুহাম্মেদ), পূর্ণ নাম : আবু আল-কাশিম মুহাম্মাদ ইবনে ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম (ابو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم) হলেন ইসলামের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী বিশ্বাসমতে আল্লাহ বা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ নবী।[৬][n ১][n ২] (আরবি: النبي আন-নাবিয়্যু) তথা "বার্তাবাহক" (আরবি :

ال ر سول আর-রাসুল) যার উপর ইসলামী প্রধান ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অমুসলিমদের মতে তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তক[৭]। অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা ও বিশেষজ্ঞদের মতে[৮][৯] মুহাম্মাদ ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা[১০][১১][১২][১৩][১৪] তার এই বিশেষত্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় জগতেই চূড়ান্ত সফলতা অর্জন। তিনি ধর্মীয় জীবনে যেমন সফল তেমনই রাজনৈতিক জীবনেও। সমগ্র আরব বিশ্বের জাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে তিনি অগ্রগণ্য[১৫]; বিবাদমান আরব জনতাকে একীভূতকরণ তার জীবনের অন্যতম সফলতা।

জন্ম

মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন তৎকালীন আরবে অবস্থিত মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রচলিত ধারণা মতে, তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট বা আরবি রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মান।[২৪]। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মন্টগোমারি ওয়াট তার পুস্তকে ৫৭০ সাল উল্লেখ করেছেন; তবে প্রকৃত তারিখ উদঘাটন সম্ভবপর হয় নি। তাছাড়া মুহাম্মাদ নিজে কোনো মন্তব্য করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি; এজন্যই এটি নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। এমনকি মাস নিয়েও ব্যাপক মতবিরোধ পাওয়া। তবে তার জন্মের বছরেই হস্তী যুদ্ধের ঘটনা ঘটে[২৫][২৬] এবং সে সময় সম্রাট নরশেরওয়ার সিংহাসনে আরোহণের ৪০ বছর পূর্তি ছিল এ নিয়ে কারো মাঝে দ্বিমত নেই। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর বিশেষ গুণের কারণে তিনি আরবে "আল-আমীন" বা "বিশ্বস্ত" উপাধিতে ভূষিত হন। স্রষ্টার নিকট হতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি মানুষকে ইসলাম ধর্ম এর দিকে দাওয়াত দেন। তাঁকে ইসলামের শ্রেষ্ঠ বাণী-বাহক (নবী) হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা হয়। মুসলমানরা তাঁকে একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে দেখেন না। তাঁদের কাছে মুহাম্মদ (সাঃ) বরং আল্লাহ প্রেরিত নবী-পরম্পরার শেষ নবী; যিনি আদম, ইব্রাহিম ও অন্যান্য নবীদের প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মেরই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। তার পূর্বের একেশ্বরবাদী ধর্ম বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামকে শেষ প্রেরিত ধর্ম হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপস্থাপন করেন।

ইসলাম ধর্মমতে, তিনি চল্লিশ বছর বয়স হতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ২৩ বছর যাবৎ ফেরেশতা জিব্রাইল (আ:) মারফত ঐশী বাণী লাভ করেন। এই বাণীসমূহের একত্ররূপ হলো পবিত্র কোরআন, যা তিনি মুখস্থ করেন ও তাঁর অনুসারীদের (সাহাবী) দিয়ে লিপিবদ্ধ করান। কারণ, তিনি নিজে লিখতে ও পড়তে জানতেন না।

“ "তুমি তো এর আগে কোনো কিতাব পড় নি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লেখনি যে অবিশ্বাসীরা সন্দেহ পোষণ করবে।"২৯:৪৮ [১০] ”

মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ। সকল মুসলমান বিশ্বাস করেন মুহাম্মদ (সাঃ) এই বাণী নির্ভুলভাবে প্রচার করেছেন। এবং তাতে কোনো কিছু যোগ করেননি।

“ "সে যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করতো, তবে আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম, ”

অতঃপর কেটে দিতাম তাঁর গ্রীবা। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।" ৬৯:৪৪-৪৭ [১০]

মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) ও সর্বোপরি সকল নবী ঐশী বাণী প্রচারে কখনো ভুল করেন নি। তবে মানবিক এবং পার্থিব কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি মানুষ হিসেবে নিজের পক্ষ থেকে মত দিয়েছেন বলে (আহালুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত বা সুন্নীরা) বিশ্বাস করে থাকে। কিন্তু শিয়ারা মনে করে থাকে, সকল নবী ও তাদের ইমামগণ সর্বাবস্থায় নির্ভুল ছিলেন; যা ধর্মগ্রন্থ কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীত। কারণ মুহাম্মদ (সাঃ) এর সকল প্রকার মানবিক ও পার্থিব সিদ্ধান্তগুলো স্বয়ং আল্লাহ্ শুধরে দিতেন। উদাহরণ হিসেবে নিম্নলিখিত আয়াতটি আলোচনা করা হয়:[১২]:

“ "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা নিজের উপর হারাম করছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।" ৬৬:১ [১০] ”

এভাবে কুরআনের আরও কয়েক জায়গায় মুহাম্মদের (সাঃ) কাজ শুধরে দেয়া হয়েছে। এই আয়াতগুলো আল্লাহর বাণী নির্ভুল এবং অপরিবর্তিতভাবে প্রচার করার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কারণ নির্ভুলভাবে প্রচারের ইচ্ছা না থাকলে নিজের অসম্মান হয় এমন কিছুই তিনি প্রচার করতেন না। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, মানুষ হিসেবে সিদ্ধান্ত দিতে হলে মুহাম্মদ (সাঃ) কখনো কখনো ভুল করতেন। কিন্তু ঐশ্বিক বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি কখনো ভুল করেননি। তাঁর জীবনকালে তিনি সম্পূর্ণ আলৌকিকভাবে মেরাজ লাভ করেন।

মুসলমানদেরকে শেষ বাণীবাহক মুহাম্মদের নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে "সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম" বলতে হয়। এর অর্থ: 'আল্লাহ তাঁর উপর রহমত এবং শান্তি বর্ষণ করুন।' একে বলা হয় দরুদ শরীফ। এছাড়াও আরও অনেক দরুদ হাদীসে বর্ণীত আছে। তাঁর মধ্যে এটাই সর্বপেক্ষা ছোট। কোনো এক বৈঠকে তাঁর নাম নিলে দরুদ একবার বলা অবশ্যকর্তব্য (ওয়াজিব)।

হাদিস

'হাদীস' (الحديث) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কথা, বাণী, কথা-বার্তা, আলোচনা, কথিকা, সংবাদ, খবর, কাহিনী ইত্যাদি। [১৩] ইসলামী পরিভাষায় মুহাম্মদের (সাঃ) কথা, কাজ, অনুমোদন এবং তাঁর দৈহিক ও চারিত্রিক যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে হাদীস বলে। মুহাম্মদের জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবীরা তাঁর হাদীসসমূহ মুখস্থ করে সংরক্ষণ করতেন। প্রথমত হাদীস লেখার অনুমতি ছিলো না, যাতে হাদীস এবং কোরআন পরস্পর মিলে না যায়। পরবর্তীতে মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই তাঁর কোনো কোনো সাহাবী বা সহচরকে হাদীস লেখার অনুমতি প্রদান করেন।[১৪] মুহাম্মদের (সাঃ) মৃত্যুর পর তার সাহাবীরা নিয়মিত তাঁর হাদিসগুলো চর্চা করতেন ও তাদের ছাত্রদের কাছে বর্ণনা করতেন। মহাম্মদের সাহাবীদের ছাত্র তথা তাবেঈরা ওমর ইবন আব্দুল আযীযের আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হাদীস লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেন।[১৫]

মুহাম্মদের (সাঃ) কথা-কাজসমূহের বিবরণ এভাবে লোকপরম্পরায় সংগ্রহ ও সংকলন করে সংরক্ষণ করা হলে তাঁর বক্তব্যসমূহ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উন্মুক্ত হয়। বিভিন্ন বিখ্যাত পণ্ডিতেরা এই কাজে ব্রতী ছিলেন। তাঁদের সংকলিত সেসব হাদিস-সংকলন গ্রন্থের মধ্যে ছয়টি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ হয়েছে। এগুলো 'ছয়টি হাদিস গ্রন্থ' (কুতুবুস সিত্তাহ) আখ্যা দেয়া হয়। তবে এটা ভাবা ভুল হবে যে, এই ছয়খানা গ্রন্থের বাইরে আর কোনো বিশুদ্ধ হাদিস নেই। এর বাইরেও বহু বিশুদ্ধ হাদিসের সংকলন রয়েছে। হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের বিভিন্ন মাপকাঠি রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হাদীসের সনদ বা "হাদিস প্রাপ্তির সূত্র" যাচাই।

কিয়ামত/ইসলামী পরকাল

কিয়ামতে বা ইসলামী পরকালবিদ্যা বা শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস ইসলামের মূল বিশ্বাসগুলির একটি, যেখানে ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ (আরবি: يوم القيامة "বাংলা: পুনুরুত্থান দিবস") বা ইয়াওমিদ-দ্বীন (আরবি: يوم الدين বাংলা: বিচার দিবস") সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয়। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগৎ ধ্বংস করবেন, মানব ও জ্বিন দেহের পুনুরুত্থান ঘটাবেন, তাদের বিচার করবেন এবং তাদের কৃতকর্মের ফলাফল শেষে পুরস্কার বা শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ শেষে জান্নাত/বেহেশত কিংবা জাহান্নাম/দোযখ এ পাঠানো হবে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কিয়ামতের সম্পর্কে কিছু আগাম নিদর্শন প্রকাশ করে গেছেন, যেমন

বড় লক্ষণসমূহ

- মিথ্যা দজ্জাল; একচোখ অন্ধ, একচোখ সুস্থ এবং বিশাল ক্ষমতা নিয়ে আত্বপ্রকাশ করবে এবং নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করবে।
- ইমাম মাহদীর আত্বপ্রকাশ।
- মানুষ মদীনা ত্যাগ করবে, খাঁটি মুমিনগণ মাহদীকে অণুসরণ করবে এবং কাফিররা করবে দাজ্জালকে।
- দাজ্জালকে হত্যা এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দ্বিতীয় আসমান থেকে ঈসা (আঃ) এর প্রত্যাবর্তন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পৃথিবী শাসন করবেন।
- ইয়া'জুজ এবং মা'জুজ নামক অবাধ্য প্রাণীর দুটি গোত্র , যারা যুলকারণাইনের সাহায্যে বন্দী হয়েছিল তারা বেরিয়ে আসবে।
- মক্কায় আক্রমণ করা হবে এবং কাবাঘর ধ্বংস করা হবে।
- দক্ষিণ দিক থেকে এক সুখকর বাতাসের আগমণ যার স্পর্শে সকল মুমিনের প্রশান্তিময় মৃত্যু ঘটবে।
- মানুষ কুরআন ভুলে যাবে এবং কেউ এর আয়াত স্বরণ করবে না।
- ইসলামী জ্ঞান লোপ পাবে যেখানে কেউ কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করবে না, কিন্তু তার পরিবর্তে বৃদ্ধ লোকেরা না বুঝে "আল্লাহ, আল্লাহ" বলে বিড়বিড় করবে।

- দাব্বাতুল আরদ নামক পশু মানুষের সাথে কথা বলার জন্য ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসবে।
- মানুষ রাস্তাঘাটে 'গাধাদের মত' ব্যভিচার করবে।
- একটি বিশাল কালো ধোয়ার মেঘ পৃথিবীকে ঢেকে ফেলবে।
- পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে।
- ইস্রাফিল (আঃ) এর প্রথম শিঙ্গার ফুকে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হবে ও চল্লিশ দিন নীরবতা থাকবে।
- দ্বিতীয় ফুকে সকল মৃত মানুষ পুনরুত্থিত হবে এবং একটি অগ্নিকুন্ড তাদের বিচারের জন্য হাশরের মাঠে একত্রিত করবে।

ছোট লক্ষণসমূহ

- সময় খুব দ্রুত বয়ে যাবে। [বুখারী, মুসলিম, ও আহমাদ]
- ভাল কাজ হ্রাস পাবে। [বুখারী]
- মানুষ কৃপণ হয়ে যাবে। [বুখারী]
- খুন এবং হত্যা বেড়ে যাবে। [বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজাহ, ও আহমাদ]
- ভুল ব্যক্তিকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া হবে। [বুখারী]
- সততা হারিয়ে যাবে। [বুখারী]
- জ্ঞানের বিলোপ ও অজ্ঞতার বৃদ্ধি। [বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজাহ, ও আহমাদ]
- ফোরাত নদীর তল থেকে একটি স্বর্ণের পাহাড় সিলগালা করে দেয়া হবে, কেউ তা থেকে কিছু নেবে না।
- ৩০ জন ভন্ড নবীর আগমণ। [বুখারী]
- একই ধর্মের দুটি বৃহত্তর ধর্মীয় দল একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটাবে। [বুখারী ও মুসলিম]
- ভুমিকম্প বৃদ্ধি পাবে। [বুখারী ও মুসলিম]
- সম্পদের প্রাচুর্য এতটাই বৃদ্ধি পাবে যে যাকাত নেয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে। [বুখারী]
- যখন লোকেরা বড় বড় দালান তৈরি করতে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে। [বুখারী]
- কোন এক লোক কবরের পাশে দিয়ে হেটে যাবে আর আশা করবে যদি সে নিজে সেখানে থাকতে পারতো। [বুখারী]
- মুসলিমদের দ্বারা কনস্টানটিনোপল বিজয়। [আহমাদ, মুসলিম]
- গাছ ও পাথর ইহুদির বিরুদ্ধে লড়তে মুসলিমদের সাহায্য করবে।
- মাদকদ্রব্য গ্রহণ ব্যাপক বিস্তার লাভ করবে। [বুখারী ও মুসলিম]
- ব্যভিচার ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক সহজ হয়ে যাবে। [বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজাহ]

- নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেড়ে যাবে, এমনকি একজন পুরুষের বিপরীতে হবে পঞ্চাশজন মহিলা হবে। [বুখারী, মুসলিম, ও আহমদ]
- মানুষ মসজিদের ক্ষমতার জন্য কঠোর সংগ্রাম করবে।
- ভাল মানুষেরা প্রতারিত হবে। [ইবন মাজাহ]
- যাকাত প্রদানকে সবাই বোঝা মনে করবে এবং কৃপণতা বেড়ে যাবে; দান করা হবে অনিচ্ছুকভাবে। [তিরমিযী, ইবন মাজাহ]
- নেতাগণ আল্লাহর বিধান অণুযায়ী শাসন করবেন না।
- শুধু ধনীরাই লাভের ভাগ পাবে, গরিবেরা পাবে না। [তিরমিযী]
- নিকৃষ্টতম লোকেরা জনগণের নেতা হবে।

ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহ

ইসলামের ৫টি মূল স্তম্ভ রয়েছে। এগুলো হলো-

- কালেমা (বিশ্বাস)
- নামাজ (প্রার্থনা)
- রোজা
- যাকাত (দান)
- হজ্জ্ব (মক্কা ভ্রমণ)

কালেমা (বিশ্বাস)

কালেমা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। এর মাধ্যমেই ইসলামের প্রথম স্তম্ভ শাহাদাহ্ পূর্ণতা পায়। ইসলামে মোট ছয়টি কালেমা রয়েছে।

প্রথম কালেমা তাইয়্যেবা

কালেমায়ে তাইয়্যেবা এর অর্থ হল পবিত্র বাক্য।

- লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। (সাঃ)।

বাংলা অনুবাদ : আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার প্রেরিত রাসুল।

দ্বিতীয় কালেমা শাহাদাহ্

কালেমায়ে শাহাদাত এর অর্থ হল সাক্ষ্য বাক্য।

- আশ্হাদু আল–লা–ইলা–হা ইল্লাল্লা–হু ওয়াহ্দাহু–লা–শারীকালাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু। (সাঃ)।

বাংলা অনুবাদ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রাসুল।

তৃতীয় কালেমা তামজীদ

কালেমায়ে তামজীদ এর অর্থ হল শ্রেষ্ঠত্ববাদ বাক্য

- সুবহানআল্লাহী ওয়ালহামদু লিল্লাহী ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আযীম।

বাংলা অনুবাদ : মহিমান্বিত আল্লাহ্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ্ মহান। সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহ্র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি নাই, কোন ক্ষমতা নাই, তিনি সম্মানিত, তিনি মহান।

চতুর্থ কালেমা তাওহীদ

কালেমায়ে তাওহীদ এর অর্থ হল একত্ববাদ বাক্য।

- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু উহয়ী ওয়া ইয়োমিতু ওয়া হুয়া হাইয়ুল লা ইয়ামুতু আবাদান আবাদা জুল জালালি ওয়াল ইকরাম বি ইয়াদিহিল খাইর ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

বাংলা অনুবাদ : আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সকল ক্ষমতা এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি সকল সম্মানের মালিক। তাঁর হাতেই সকল মঙ্গল এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

পঞ্চম কালেমা রদ্দে কুফর

ইহা ইসলামে অবিশ্বাসীদের প্রত্যাখ্যানমূলক বাক্য হিসেবেও পরিচিত।

- আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন উশরিকা বিকা শাইআও ওয়ানা আলামু বিহি ওয়াস্তাগফিরুকা লিমালা আলামু বিহি তুবতু আনহু ওয়া তাবাররাতু মিনাল-কুফরি ওয়াশ-শিরকী ওয়াল-কিজবি ওয়ালা-গিবাতি ওয়াল-বিদাতি ওয়ান্না-মিমাতি ওয়াল-ফাওয়া হিশি ওয়াল-রুহতানী ওয়াল-মাআসি কুল্লিহা ওয়াসলামতু ওয়াকুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)।

বাংলা অনুবাদ : হে আল্লাহ্ নিশ্চয়, ক্ষমা চাই শিরক করা থেকে, আমি ক্ষমা চাই সকল পাপ থেকে যা সম্পর্কে আমি সচেতন নই বা জানি না, আমি পুনরায় ঘোষণা করছি, আমি সকল প্রকার কুফর থেকে, শিরক থেকে, মিথ্যা (কথা বলা), গীবত, বিদাত, পরনিন্দা, অশ্লীলতা এবং অন্যান্য সকল পাপ থেকে মুক্ত। আমি ইসলাম স্বীকার এবং বিশ্বাস করি এবং ঘোষণা দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসুল।

ষষ্ঠ কালেমা আস্তাগফের

ইহা অনুশোচনামূলক বাক্য হিসেবেও পরিচিত। কালেমা–ই–আস্তাগফের।

- আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবি আয নাবতুহু আমাদান আওখাতাআন সিররান আওয়ালা নিয়াতান ওয়াতুবু ইলাইহি মিনাযযামবিল্লাজি ওয়ামিনাযযামবিল্লাজি লা আলামু ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ুবী ওয়া সাত্তারুল উইয়ুবী ওয়া গাফফারুজজুনুবি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আযীম।

বাংলা অনুবাদ : আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই সকল পাপ থেকে, যা আমি সংঘটিত করেছি আমার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, গোপনে বা প্রকাশ্যে এবং আমি আমার পালনকর্তার আশ্রয় চাই সেই পাপ থেকে, যে পাপ আমি জানি এবং যে পাপ আমি জানিনা। অবশ্যই আপনি লুকানো এবং গোপন (ভুল) পাপ সম্পর্কে জানেন এবং ক্ষমাশীল। আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন শক্তি নেই, কোন ক্ষমতা নেই, তিনি সম্মানিত, তিনি মহান।

নামায

নামায, নামাজ (ফার্সি: نَماز) বা সালাত হল ইসলাম ধর্মের প্রধান উপাসনাকর্ম। প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত (নির্দিষ্ট নামাযের নির্দিষ্ট সময়) নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক বা ফরজ। নামায ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। শাহাদাহ্‌ বা বিশ্বাসের পর নামাযই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

নামায শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে উদ্ভূত (ফার্সি: نماز) এবং বাংলা ভাষায় পরিগৃহীত একটি শব্দ যা আরবি ভাষার সালাত শব্দের (আরবি: صلاة , কুরআনিক আরবি: صلوة ,) প্রতিশব্দ। বাংলা ভাষায় 'সালাত'-এর পরিবর্তে সচরাচর 'নামাজ' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, তুর্কী এবং বাংলা ভাষায় একে নামায (ফার্সি ভাষা থেকে উদ্ভূত) বলা হয়। কিন্তু এর মূল আরবি নাম সালাত (একবচন) বা সালাহ্‌ (বহুবচন)।

"সালাত" -এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ: ‘শরী ‘আত নির্দেশিত ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে ‘সালাত’ বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়’ ।

শর্ত

কারো ওপর নামাজ ফরয হওয়ার জন্য শর্তগুলো হলোঃ-

- মুসলমান হওয়া
- সাবালক হওয়া এবং
- সুস্থ মস্তিস্কের হওয়া

নামাযের শর্তাবলী

নিম্নের পাঁচটি কারণ সংঘটিত হলে নামাজ বৈধ হয়।

- নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হলে। অনিশ্চিত হলে নামাজ হবে না, যদি তা ঠিক ওয়াক্তেও হয়।
- কাবামুখী হয়ে দাঁড়ানো। তবে অসুস্থ এবং অপারগ ব্যাক্তির জন্য এই শর্ত শিথিলযোগ্য।
- সতর ঢাকা থাকতে হবে। পুরুষের সতর হল নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ (টাখনুর উপরে) পর্যন্ত, আর নারীর সতর হল মুখমণ্ডল, দুই হাতের কব্জি ও দুই পায়ের পাতা ব্যতীত সারা শরীর।
- পরিধেয় কাপড়, শরীর ও নামাজের স্থান পরিষ্কার বা পাক-পবিত্র হতে হবে।
- অযু, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা আর্জন করতে হবে।

নামাযের ফরজ

নামাযের ফরজ মোট ১৩ টি। আহকাম ৬ টি। আরকান ৭ টি। নামাযের বাহিরের কাজগুলিকে আহকাম বলে। আর নামাযের ভিতরের কাজগুলোকে আরকান বলে।

আহকাম

১. শরীর পাক ২. কাপড় বা বস্ত্র পাক ৩. বিছানা(যেখানে নামায পড়া হবে) পাক ৪. ছতর ঢাকা ৫. ক্বেবলামুখী হওয়া ৬. নিয়্যত করা।

আরকান

১. তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে নামায শুরু করা ২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া ৩. আলহামদুর সাথে ক্বোরআন পড়া ৪. রুকু করা ৫. ছেজদা করা ৬. শেষ বৈঠক করা ৭. নামাযের শেষে কোন কাজ বা কথা বলে (নামায হতে) বের হওয়া

নামাজের নিয়ম

নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। নামাজের ধাপ বা অংশকে রাকাত বলা হয়। প্রতি রাকাতের শুরুতে সুরা ফাতিহা ও অপর একটি সুরা পাঠের পর রুকু করতে হয় অর্থাৎ হাঁটুতে হাত রেখে ভর দিয়ে পিঠ আনুভূমিক করে অবনত হতে হয়। রুকু থেকে দাঁড়িয়ে তার পর সিজদা দিতে হয়। তিন বা চার রাকাতের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে সিজদার পর বসে "আত্তাহিয়াতু" দোয়া পড়তে হয়। নামাজের শেষ রাকাতে সিজদার পর বসে "আত্তাহিয়াতু" দোয়ার সাথে "দরুদ শরীফ" পড়তে হয়। নামাজের শেষভাগে দুই দিকে সালাম ফেরাতে হয়। এর পর দলবদ্ধভাবে মুনাজাত বা প্রার্থনা করা হয়ে থাকে, যদিও তা নামাজের অংশ নয় এবং সহীহ হাদীসপন্থীদের মতে এটি বিদআত বা নবসৃষ্টি । নামাজের কিছু নিয়ম পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। তবে এসব বিতর্ক এড়িয়ে নামাযের সবচেয়ে বিশুদ্ধ পদ্ধতি হল বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় সহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীস মোতাবেক নামাজ আদায় করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ،

‘তোমরা সালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ’ ... (বুখারী হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; মিশকাত হা/৬৮৩, ‘সালাত’ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৬)"।

নামাযের ওয়াক্ত ও রাকাত

প্রতিদিন একজন মুসলমানকে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হয়। প্রথম ওয়াক্ত হল "ফজর নামাজ" সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এর ব্যপ্তিকাল। এরপর "যোহর ওয়াক্ত" বেলা দ্বিপ্রহর হতে "আছর ওয়াক্ত"-এর আগ পর্যন্ত যার ব্যপ্তি। তৃতীয় ওয়াক্ত "আছর ওয়াক্ত" যা সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত পড়া যায়। চতুর্থ ওয়াক্ত হচ্ছে "মাগরীব" যা সূর্যাস্তের ঠিক পর পরই আরম্ভ হয় এবং এর ব্যপ্তিকাল প্রায় ৩০-৪৫ মিনিট। "মাগরীব ওয়াক্ত" এর প্রায় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট পর আরম্ভ হয় "এশা ওয়াক্ত" এবং এর ব্যপ্তি প্রায় "ফজর ওয়াক্ত"-এর আগ পর্যন্ত।

উপরোক্ত ৫ টি ফরজ নামায ছাড়াও এশা'র নামাজের পরে বিতর নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি সুন্নত নামাজ ও মুসলমানরা আদায় করে থাকে।

রোযা

রোযা বা রোজা (ফার্সি روزه রুজে), সাউম (আরবি صوم স্বাউম্), বা সিয়াম ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির তৃতীয়। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার এবং সেই সাথে যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকেও বিরত থাকার নাম রোযা। ইসলামী বিধান অনুসারে, প্রতিটি সবল মুসলমানের জন্য রমযান মাসের প্রতি দিন রোজা রাখা ফরজ (فرض ফার্দ্) বা অবশ্য পালনীয়।

রোজার প্রকারভেদ

রোজা পাঁচ প্রকার।

ফরজ রোজা: যা আবার চার প্রকার-ক) রমজান মাসের রোজা। খ) কোন কারণ বশত রমজানের রোজা ভঙ্গ হয়ে গেলে তার কাযা আদায়ে রোজা। গ) শরীয়তে স্বীকৃত কারণ ব্যতিত রমজানের রোজা ছেড়ে দিলে কাফ্ফারা হিসেবে ৬০টি রোজা রাখা। ঘ) রোজার মান্নত করলে তা আদায় করা।

ওয়াজিব রোজা: নফল রোজা রেখে ভঙ্গ করলে পরবর্তীতে তা আদায় করা ওয়াজিব।

সুন্নত রোজা: মহরম মাসের নয় এবং দশ তারিখে রোজা রাখা।

মোস্তাহাব রোজা: প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, এবং ১৫ তারিখে, প্রতি সাপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারে, কোন কোন ইমামের মতে শাওয়াল মাসে পৃথক পৃথক প্রতি সপ্তাহে দুটো করে ছয়টি রোজা রাখা

মোস্তাহাব। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এক সাথে হোক কিংবা পৃথক পৃথক হোক শাওয়ালের ছয়টি রোজা মাকরূহ।

নফল রোজা: মোস্তাহাব আর নফল খুব কাছাকাছির ইবাদত। সহজ অর্থে নফল হলো যা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত নয় এমন ইবাদত পূণ্যের নিয়তে করা। রোজার ক্ষেত্রেও তাই।

ইসলামের মূল উৎস কুরআন করীমে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে,

“ হে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার” । (সূরা বাকারা: ১৮৪) ”

অপর এক আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

“ রমযান মাস হচ্ছে সেই মাস যার মাঝে কুরআন করীম নাযেল করা হয়েছে। যা মানুষের জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত, পথ প্রদর্শনের দলিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এই মাসকে পাবে তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। আর যদি কেউ রুগ্ন হয় অথবা সফরে থাকে তাহলে সে সমপরিমাণ রোযা অন্যান্য দিনসমূহে আদায় করবে। আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহর মহিমা কীর্তন কর এইজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর” । (সূরা বাকারা: ১৮৬) ”

রোজার উদ্দেশ্য

রোজা রাখা বা সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরহেজগারি বা তাকওয়া বৃদ্ধি করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

“ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)। ”

‘তাকওয়া’ শব্দটির মূল অর্থ ‘রক্ষা করা।’ এর অনুবাদ করা হয়েছে নানাভাবে। যেমন পরহেজগারি, আল্লাহর ভয়, দ্বীনদারি, সৎ কর্মশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি। রোজা রাখা হয় এ জন্য যে, এই তাকওয়ার দীক্ষায় আমরা দীক্ষিত হবো। রোজা ঢালের মতো কাজ করে, যা গোনাহের হাত থেকে আমাদের বাঁচায়। এর মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা আখেরাতে আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি [৪]

রোজার ফযিলত

রমজানরে একটি বিশেষ ফজিলত বা মাহাত্ন হচ্ছে,এই পবিত্র রমজান মাসে আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। রমজান মাসের রোজা মানুষকে পাপ-পন্কিলতা থেকে মুক্তি দেয়,মানুষের কুপ্রবৃত্তি ধুয়ে মছে দেয় এবং আত্নাকে দহন করে ঈমানের শাখা প্রশাখা সন্জীবীত করে। সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এই মর্মে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন,

“ রোজাদারের জন্য দুটি খুশি একটি হলো তার ইফতারের সময়, আর অপরটি হলো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।(বুখারী ও মুসলিম) ”

যাকাত

যাকাত (আরবি: زكاة zakāt, "যা পরিশুদ্ধ করে",[১] আরও আরবি: زكاة ألمال, "সম্পদের যাকাত"[২]) হলো ইসলাম ধর্মের পঞ্চস্তম্ভের একটি। প্রত্যেক স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলমান নর-নারীকে প্রতি বছর স্বীয় আয় ও সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ, যদি তা ইসলামী শরিয়ত নির্ধারিত সীমা (নিসাব পরিমাণ) অতিক্রম করে তবে, গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের নিয়মকে যাকাত বলা হয়।[৩][৪] সাধারণত নির্ধারিত সীমাতিক্রমকারী সম্পত্তির ২.৫ শতাংশ (২.৫%) বা (১/৪০).[৫][৬] অংশ বছর শেষে বিতরণ করতে হয়। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে হজ্ব এবং যাকাতই শুধুমাত্র শর্তসাপেক্ষ যে, তা সম্পদশালীদের জন্য ফরয বা আবশ্যিক হয়। উল্লেখ্য, নিসাব পরিমাণ হলেই যাকাত কোনো ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয় এবং তখন তার উপর 'যাকাত' নামক ফরয বর্তায়; অর্থাৎ যাকাত আদায় করা ফরয। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনে "যাকাত" শব্দের উল্লেখ এসেছে ৩২ বার।কুরআনে নামাজের পরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পূর্ন বিষয় হিসাবে উল্লেখ এই যাকাত।

যাকাতের শর্তসমূহ

স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলমান নর-নারীর কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে তার উপর যাকাত ফরয হয়ে থাকে। যেমন:

১. সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা

সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ সম্পদ, মালিকের অধিকারে থাকা, সম্পদের উপর অন্যের অধিকার বা মালিকানা না থাকা এবং নিজের ইচ্ছামতো সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার থাকা। যেসকল সম্পদের মালিকানা সুস্পষ্ট নয়, সেসকল সম্পদের কোনো যাকাত নেই, যেমন: সরকারি মালিকানাধীন সম্পদ। অনুরূপভাবে

জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ওয়ক্ফকৃত সম্পদের উপরেও যাকাত ধার্য হবে না। তবে ওয়াক্ফ যদি কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য হয়, তবে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

২. সম্পদ উৎপাদনক্ষম হওয়া

যাকাতের জন্য সম্পদকে অবশ্যই উৎপাদনক্ষম, প্রবৃদ্ধিশীল হতে হবে, অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি পাবার যোগ্যতাই যথেষ্ট। যেমন: গরু, মহিষ, ব্যবসায়ের মাল, নগদ অর্থ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রীত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মালামাল বর্ধনশীল।[৮] অর্থাৎ যেসকল মালামাল নিজের প্রবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম নয়, সেসবের উপর যাকাত ধার্য হবে না, যেমন: ব্যক্তিগত ব্যবহারের মালামাল, চলাচলের বাহন ইত্যাদি।

৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ

যাকাত ফরয হওয়ার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে শরীয়ত নির্ধারিত সীমাতিরিক্ত সম্পদ থাকা। সাধারণ ৫২.৫ তোলা রুপা বা ৭.৫ তোলা স্বর্ণ বা উভয়টি মিলে ৫২.৫ তোলা রুপার সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হয়। পশুর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ বিভিন্ন (বিস্তারিত: 'যাকাত প্রদানের নিয়ম' দ্রষ্টব্য)।

৪. মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থাকা

সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে যে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে, শুধুমাত্র তার উপরই যাকাত ফরয হবে। এপ্রসঙ্গে আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে:

লোকজন আপনার নিকট (মুহাম্মদের [স.] নিকট) জানতে চায়, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলুন, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান বলে দেন।[৯]

মুহাম্মদের [স.] সহচর ইবনে আব্বাস [রা.] বলেছেন,

> “ অতিরিক্ত বলতে পরিবারের ব্যয় বহনের পর যা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝায়।[১০] ”

জনাব ইউসুফ আল কারযাভী'র মতে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, ও পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের ভরণ-পোষণও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।[১১]

৫. ঋণমুক্ততা

নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলেও ব্যক্তির ঋণমুক্ততা, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্যতম শর্ত। যদি সম্পদের মালিক এত পরিমাণ ঋণগ্রস্থ হন যা, নিসাব পরিমাণ সম্পদও মিটাতে অক্ষম বা নিসাব পরিমাণ সম্পদ

তার চেয়ে কম হয়, তার উপর যাকাত ফরয হবে না। ঋণ পরিশোধের পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই কেবল যাকাত ওয়াজিব হয়। তবে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটি হলো: যে ঋণ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় সে ঋণের ক্ষেত্রে যেবছর যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে হয়, সেবছর সে পরিমাণ ঋণ বাদ দিয়ে বাকিটুকুর উপর যাকাত দিতে হয়। কিন্তু ঋণ বাবদ যাকাত অব্যাহতি নেয়ার পর অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় সে সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে।

৬. সম্পদ এক বছর আয়ত্তাধীন থাকা

নিসাব পরিমাণ স্বীয় সম্পদ ১ বছর নিজ আয়ত্তাধীন থাকাই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বশর্ত।[১২] তবে কৃষিজাত ফসল, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির যাকাত (উশর) প্রতিবার ফসল তোলার সময়ই দিতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে বছর শেষে উদ্বর্তপত্রে (Balance Sheet) বর্ণিত সম্পদ ও দায়-দেনা অনুসারে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে যাকাত

অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের যাকাত: সম্পদের মালিক অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা পাগল হলে, তার যাকাত তার আইনানুগ অভিভাবককে আদায় করতে হবে।

যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তির যাকাত: কোনো সম্পদে যৌথ মালিকানা থাকলে সম্পদের প্রত্যেক অংশীদার তাঁর স্ব স্ব অংশের উপরে যাকাত দিবেন, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় বা তার অতিরিক্ত হয়। অর্থাৎ সম্পদের স্বীয় অংশের মূল্য অন্যান্য সম্পদের সাথে যোগ করে হিসাব করে যদি দেখা যায় তা নিসাব পরিমাণ হয়েছে বা অতিক্রম করেছে, তবে যাকাত দিতে হবে।

নির্ধারিত যাকাত: যাকাত নির্ধারিত হওয়াসত্ত্বেয় পরিশোধের আগেই সম্পদের মালিকের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারগণ অথবা তার তত্ত্বাবধায়ক তার সম্পত্তি থেকে প্রথমে যাকাত বাবদ পাওনা ও কোনো ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করবেন। এরপর অবশিষ্ট সম্পত্তি, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে।

তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত সম্পদের যাকাত: মালিকের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত আইনানুগ তত্ত্বাবধায়কের কাছে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকলে মালিকের পক্ষে উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সে যাকাত পরিশোধ করবেন।

বিদেশস্থ সম্পদের যাকাত: যাকাত ওয়াজিব হবার জন্য সম্পত্তি নিজ দেশে থাকা শর্ত নয়। বরং সম্পত্তি অন্য দেশে থাকলেও তার উপর যাকাত দিতে হবে। তবে উক্ত দেশ ইসলামী রাষ্ট্র হলে এবং দেশের সরকার যাবতীয় সম্পদের উপর যাকাত দিলে তা আর আলাদা করে দিতে হবে না।

যাকাত বন্টনের খাতসমূহ

পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তাওবা যাকাত বন্টনে আটটি খাত আল্লাহ তায়ালা নির্ধারন করেছেন।[১৩] । এই খাতগুলো সরাসরি ক্বোরআন দ্বারা নির্দিষ্ট, এবং যেহেতু তা আল্লাহ'র নির্দেশ, তাই এর বাইরে যাকাত বন্টন করলে যাকাত, ইসলামী শরিয়তসম্মত হয় না।[১৪][ক]

- মুসলমান ফকির (যার কিছুই নেই)[১৫]
- মুসলমান মিসকীন (যার নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই) [১৫]
- যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী (যার অন্য জীবিকা নেই) [১৫]
- (অমুসলিমদের) মন জয় করার জন্য[১৬]
- ক্রীতদাস (মুক্তির উদ্দেশ্যে)
- ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি যার সম্পদের তুলনায় ঋণ বেশী
- (স্বদেশে ধনী হলেও বিদেশে) আল্লাহর পথে জেহাদে রত ব্যক্তি
- মুসাফির (যিনি ভ্রমণকালে অভাবে পতিত)

হাদিসমতে, এগুলো ফরয সাদকাহের খাত, এবং নফল সাদকাহ এই আট খাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর পরিসর আরো প্রশস্ত।[১৭] উল্লেখিত খাতসমূহে যাকাত বন্টন করতে সঠিক পন্থায়। অনেকে যাকাতের অর্থে শাড়ি ক্রয় করে তা বন্টন করে থাকেন। এভাবেও যাকাত আদায় হয়ে গেলেও এভাবে আসলে প্রকৃতপক্ষে যাকাত গ্রহণকারীর তেমন উপকার হয় না। তাই যাকাত বন্টনের উত্তম পন্থা হলো: যাকাত যাদেরকে প্রদান করা যায়, তাদের একজনকেই বা একটি পরিবারকেই যাকাতের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে স্বাবলম্বী করে দেয়া।

হজ্জ

হজ্জ বা হজ্ব (আরবি: حج হজ্জ) ইসলাম ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য একটি আবশ্যকীয় ইবাদত বা ধর্মীয় উপাসনা। এটি ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ্ব সম্পাদন করা ফরজ বা আবশ্যিক।[১] আরবি জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ হজ্বের জন্য নির্ধরিত সময়। হজ্জ পালনের জন্য বর্তমান সৌদী আরবের মক্কা নগরী এবং সন্নিহিত মিনা, আরাফাত, মুযদালফা প্রভৃতি স্থানে গমন এবং অবস্থান আবশ্যক। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাৎসরিক তীর্থযাত্রা।[২] যিনি হজ্জ সম্পাদনের জন্য গমন করেন তাঁকে বলা হয় হাজী।

ইসলামে হজ্জের গুরুত্ব

আবু হোরায়রা বর্ণিত এক হাদিসে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করে এবং অশ্লীল ও গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্জ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে। অর্থাৎ জন্মের পর শিশু যেমন

নিষ্পাপ থাকে, সেও তদ্রূপই হয়ে যায়।" [৩] আরেকটি হাদিসে তিনি বলেছেনঃ "শয়তান আরাফার দিন হতে অধিক লজ্জিত ও অপদস্থ আর কোনো দিন হয় না, কেননা ওই দিন আল্লাহতায়ালা স্বীয় বান্দার প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করেন ও অসংখ্য কবিরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন।" তিনি আরো বলেছেনঃ "একটি বিশুদ্ধ ও মকবুল হজ্জ সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর চেয়ে উত্তম। বেহেস্ত ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু তার প্রতিদান হতে পারে না।"